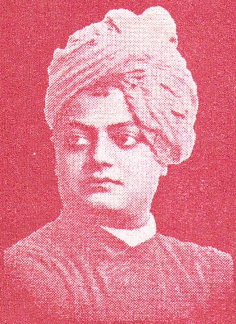
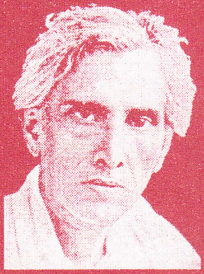








অ-সাম্প্রদায়িকতার প্রতীক হিন্দু

(বিবেকানন্দ - অরবিন্দ - রবীন্দ্রনাথ - প্রমুখের মূল্যায়ন)

আচার্য ডঃ শ্রীধ্যানেশ নারায়ণ চক্রবর্ত্তী

বাণীকণ্ঠ, শাস্ত্রী, বাচস্পতি, প্রজ্ঞাভারতী, ভক্তিরত্ন, এম.এ., পি.এইচ.ডি.

প্রকাশক ঃ বৌদ্ধিক বিভাগ
২৬, বিধান সরণি
কলকাতা-৭০০ ০০৬

প্রথম প্রকাশ ঃ বুদ্ধ পূর্ণিমা, ১৪১৭

দক্ষিণা ঃ ১০.০০ (দশ টাকা মাত্র)

মুদ্রক ঃ তুহিনা প্রকাশনী
৩০ মদন মিত্র লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৬

অ-সাম্প্রদায়িকতার প্রতীক হিন্দু

দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক পরাধীনতার অবশ্যম্ভাবী ফল সাংস্কৃতিক হীনম্মন্যতা এবং আত্মবিস্মৃতি। অতীত ইতিহাসে দেখা যায় সংঘর্ষ, রক্তক্ষয় ও ধনক্ষয়ের মাধ্যমে রাজনৈতিক আধিপত্য পরাজিত দেশে স্থাপন করা হ'ত। তারই ধারাপথে আসতো ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক পরাধীনতা। পরাজিতেরা কেউ ভয়ে কেউ বা লোভে স্বকীয় ধর্ম এবং সংস্কৃতি পরিত্যাগ ক'রে বিজয়ীর ধর্ম এবং সংস্কৃতিকে বরণ ক'রে নিতে বাধ্য হ'ত। তখন রাজনৈতিক আধিপত্যের অনুগামী ছিল সাংস্কৃতিক পরাধীনতা। যেহেতু পীড়নের মাধ্যমে এই প্রভুত্বের প্রতিষ্ঠা হ'ত, স্বাভাবিক ভাবেই পরাজিতেরা সুযোগ পেলে বিদ্রোহ ক'রে রাষ্ট্রীয়, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার পুনরুদ্ধারে ব্রতী হ'ত।

কিন্তু এখন সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মনোবিজ্ঞানসম্মত বিপরীত পন্থা অনুসৃত হয়। রাজনৈতিক মতবাদ, ধর্ম, সংস্কৃতি এবং বাণিজ্যের মাধ্যমে জনগণের চিত্তকে জয় ক'রে রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারে বহু রাষ্ট্র আজ দেশে দেশে বন্ধুত্বের নামে পরিণামে প্রভুত্বের স্থূল হস্তাবলেপে প্রাগ্রসর। এখন ক্ষমতা সম্প্রসারণের শৈলীর পরিবর্তন ঘটেছে। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মাধ্যমে রাজনৈতিক বিপ্লব, সাংস্কৃতিক আধিপত্যের মাধ্যমে রাজনৈতিক প্রভুত্ব প্রসারের সূক্ষ্ম গতি বর্তমানে দেশে দেশে পরিলক্ষিত হচ্ছে। বৃটিশ শাসনের সময় হ'তে ভারতবর্ষ তার শিকার। বর্তমানে দ্বান্দ্বিক জড়বাদীরা কম্যুনিজম্ তথা সমাজতান্ত্রিক আদর্শের প্রসারণের নামে দেশে দেশে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মাধ্যমে রাজনৈতিক বিপ্লব সংঘটিত করছেন। চীন, হাংগেরী, আফগানিস্তান, তিব্বত, ভিয়েতনাম, ভারত, শ্রীলঙ্কা প্রভৃতি দেশ তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

ভারতবর্ষের বিত্তের এবং চিত্তের ঐশ্বর্যে প্রলুব্ধ হ'য়ে গ্রীক, শক হুণ, পাঠান, মোগল, 'রণধারা বাহি' জয়গান গাহি' উন্মাদ কলরবে' ভারতে আক্রমণ, শাসন, শোষণ, নিধন, নির্যাতন ক'রে শাসন করায়ত্ত ক'রেছে। সব থাকলেও কেবলমাত্র ঐক্যচেতনা এবং রাজনৈতিক দূরদর্শিতা না থাকায় বিশাল ভারতের একের পর এক রাজ্য বিদেশী আক্রমণকারীর করতলগত হ'য়েছে। আত্মকলহ শত্রুকে ডেকে

এনেছে। সেদিনের জয়চাঁদ-পৃথ্বীরাজের মনোভাব থেকে এখনো ভারতবাসী মুক্ত হয়নি। তাই অখণ্ড ভারত ত্রিখণ্ডিত, আরও বহুধা খণ্ডিত হবার মুখে। **ক্ষুদ্র রাজনৈতিক গোষ্ঠীগত দুর্বুদ্ধি এবং ঐতিহাসিক অদূরদর্শিতা ভারতের দীর্ঘ দিনের দুর্ভাগ্য।** লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ অসহায় ভারতবাসী প্রাণ এবং সম্পদের বিনিময়ে তারই প্রায়শ্চিত্ত ক'রে চলেছে। শিক্ষিত সুবিধাবাদীদের সংকীর্ণ স্বার্থান্ধতা এবং জনতা-জনাদর্নের ঐতিহাসিক অজ্ঞতাই এই শোচনীয় দুর্দশার মূলে।

হিন্দুত্ব সম্বন্ধে অর্থবোধের অভাব এবং বিকৃত ধারণা আমাদের বর্তমান দুর্গতির এক বিশেষ কারণ। আত্মবিস্মৃতির মাধ্যমে আত্মহত্যার প্রবণতাই প্রগতিশীলতা মনে ক'রে অযৌক্তিক মূঢ়তায় আমরা আজ বিপন্ন। মুসলিম এবং খ্রীষ্টানের ন্যায় হিন্দুকেও ধর্মীয় সম্প্রদায়-বিশেষরূপে ভুলক্রমে চিহ্নিত ক'রে ব্রিটিশ শাসনের সময় থেকে বর্তমানের স্বাধীনতার কাল পর্যন্ত যে ঐতিহাসিক অন্যায় আমরা ক'রেছি মুক্তবুদ্ধিতে তার মূল্যায়ন আজ একান্তই অপেক্ষিত।

মুক্তচেতা মহাকবি রবীন্দ্রনাথ হিন্দু এবং মুসলমান শব্দের পার্থক্য যে ভাবে বিশ্লেষণ করেছেন, তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

'হিন্দু শব্দে এবং মুসলমান শব্দে একই পর্যায়ের পরিচয়কে বুঝায় না। **মুসলমান একটি বিশেষ ধর্ম, কিন্তু হিন্দু কোনো বিশেষ ধর্ম নহে।** হিন্দু ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি জাতিগত পরিণাম। ইহা মানুষের শরীর-মন-হৃদয়ের নানা বিচিত্র ব্যাপারকে বহু সুদূর শতাব্দী হইতে এক আকাশ, এক আলোক, এক ভৌগোলিক নদ-নদী অরণ্য-পর্বতের মধ্য দিয়া, অন্তর ও বাহিরের বহুবিধ ঘাত-প্রতিঘাত-পরম্পরার একই ইতিহাসের ধারা দিয়া আজ আমাদের মধ্যে আসিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছে।' *[রবীন্দ্র রচনাবলী, ১৩শ খণ্ড - পৃঃ - ১৭৫]*

বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৩ তে চিকাগোয় বিশ্বধর্ম সম্মেলনে *'Hinduism-A Universal Religion'* শীর্ষক ভাষণে হিন্দুধর্মের সর্বতোগ্রাহী রূপ সম্বন্ধে বিশ্লেষণ ক'রে বলেছিলেন — *"From the high spiritual flights of the Vedanta Philosophy of which the latest discoveries of science seem like echoes, to the low ideas of idolatry with its multifarious mythology, the agnosticism of the Buddhists and the atheism of the Jains, each and all have a place in the Hindu's religion.*

(Hinduism-Swami Vivekananda, Page-1)

'হিন্দু' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ এবং উদ্ভব ও ক্রমপরিণতি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। ভারতের উত্তর পশ্চিম ভূভাগ বৈজ্ঞানিকদের মতে পৃথিবীর প্রাচীনতম মৃত্তিকাস্থল। বিশ্বের প্রাচীনতম সভ্যতা ঐ অঞ্চলেই উদ্ভূত হ'য়েছিল। সেই সভ্যতাই সুপ্রাচীন বৈদিক তথা আর্য সভ্যতা নামে পরিচিত। সেই সমুন্নত সংস্কৃতির পরিচয়বহ গ্রন্থ বেদ পৃথিবীর প্রাচীনতম লিখিত পুস্তক। বেদ শব্দের অর্থ জ্ঞান। জ্ঞানের সাধনায় প্রদীপ্ত সেই সভ্যতাকে তাই বলা হয় 'বৈদিক সভ্যতা'। যথার্থ জ্ঞানী ব্যক্তিরা লব্ধ জ্ঞানকে পুঁথিগত না ক'রে দৈনন্দিন জীবনের আচরণে ফুটিয়ে তোলেন। ভারতে চিরকালই **'চর্চা'** কে **'চর্যায়'** রূপায়িত করার ছিল সাধনা। কায়-মনো-বাক্যে ঐক্যই মনুষ্যত্ব ব'লে ভারতে গৃহীত। সমুন্নত জ্ঞানকে পরিশীলিত আচরণে যাঁরা সার্থক ক'রে তুলতেন তাঁরাই হ'তেন 'আর্য'। **'আর্য' শব্দ গোষ্ঠীবাচক নয়, হচ্ছে গুণবাচক।** এইটি সংস্কৃত ভাষার শব্দ। সংস্কৃতে এই শব্দের অর্থ হচ্ছে —

'কর্তব্যমাচারন্ কামম্ অকর্তব্যম্ অনাচরন্।
তিষ্ঠতি প্রকৃতাচারে যঃ স আর্য ইতি স্মৃতঃ॥'

"যিনি কর্তব্য পালন করেন, অনুচিত কর্ম করেন না, সদাচারে প্রতিষ্ঠিত থাকেন, তিনিই হ'লেন 'আর্য'। 'আচরণশুদ্ধ কর্তব্যনিষ্ঠ' ব্যতীত আর কোনো অর্থেই তথা জাতি, সম্প্রদায়, ভৌগোলিক অধিবাসী-বিশেষ প্রভৃতি অর্থে এই 'আর্য' শব্দ সংস্কৃতে কখনো প্রযুক্ত হয়নি। অর্জুন ক্ষত্রিয় হ'য়েও ধর্মযুদ্ধরূপ কর্তব্যে পরাঙমুখ হওয়ায়, শ্রীকৃষ্ণ গীতায় তাঁকে 'অনার্য' বলে তিরস্কার করছেন। রাজা দুষ্মন্ত বিবাহিতা পত্নীকে অস্বীকার করছেন দেখে শকুন্তলা তাঁকে 'অনার্য' অর্থাৎ স্বামীর কর্তব্য হ'তে বিচ্যুত ব'লে ভর্ৎসনা করছেন। শ্বশুর এই সমাজে মাননীয়। তাই, তাঁর পুত্রকে তথা পতিকে ভারতীয় নারী আর্যপুত্র ব'লে সম্বোধন করেন ; এখনকার অনেক আলোকপ্রাপ্তার মতো নাম ধ'রে ডাকেন না। পত্নীকেও পতি 'আর্যে' ব'লে সম্বোধন করতেন। নাটক জীবনের প্রতিচ্ছবি। সংস্কৃতে পতি-পত্নী পরস্পরকে নাম ধ'রে ডেকে লঘুতা প্রকাশের পরিবর্তে পরিশীলিত রুচির পরিচয় দিতেন পারস্পরিক আর্য-আর্যে সম্বোধনের দ্বারা। নাটকে তাই দেখি। হনুমান সৎ এবং কর্তব্যনিষ্ঠ ব'লে বাল্মীকি, ভবভূতি, কালিদাস প্রমুখ কবিকুল তাঁকে 'আর্য' ব'লে সম্বোধন করেন। পরিচিত-অপরিচিত সজ্জনের সঙ্গে সম্বোধনের ভাষা হ'ল ভারতে 'আর্য'। ভদ্র মহিলার সঙ্গে সম্বোধনের ভাষা হ'ল 'আর্যে'। **স্থান-বিশেষের নয়, গুণ-বিশেষের অধিকারীকেই 'আর্য' ব'লে ভারতীয় পরম্পরায় চিহ্নিত করা হয়।** বৃটিশ শাসনের সময় রাজনৈতিক কূট চক্রান্তে পরাধীন ভারতীয়দের চিত্তে বৃটিশ শাসকেরা নিজেদের গুণোৎকর্ষের মনোভাব প্রতিষ্ঠিত করার জন্য 'আর্য' শব্দকে গোষ্ঠীগত তথা জাতিগত অর্থে অপব্যাখ্যা করেন। শাসক ইংরেজরাও যে ভারতীয়দের চেয়ে অনুন্নত নয়, তাই

প্রমাণ করার চেষ্টার 'আর্য' নামক জাতির রূপ-কল্পনা। তার আদি বাসস্থান নিয়েও কোনো স্থির সিদ্ধান্ত স্বাভাবিকভাবেই তাঁরা ক'রতে পারেন নি। তাঁদের কল্পিত তত্ত্ব হচ্ছে যে, হয়তো মধ্য এশিয়া, নয়তো উত্তর মেরু নয়তো অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীতে এই সুসভ্য 'আর্য' জাতি প্রথমে বাস ক'রতো। তারপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে তাদের একটি ধারা পারস্য হ'তে ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্তে প্রবেশ ক'রে সিন্ধু ও পাঞ্জাব অঞ্চলে প্রাচীনতর স্থানীয় সভ্যতাকে ধ্বংস ক'রে বসতি স্থাপন করে। আর একটি শাখা ইউরোপের দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে। যার একটি শাখা হল বৃটিশ জাতি। কিন্তু এই তত্ত্বের প্রতিষ্ঠায় কোনো লিখিত বা পাথুরে প্রমাণ গ্রন্থে বা শিলালিপিতে বিশ্বের কুত্রাপি তাঁরা দেখাতে পারেন নি। অথচ তথ্যের ভিত্তি ব্যতীত তত্ত্বের স্বীকরণে অন্যত্র তাঁরা কখনও রাজী নন। তৎকালীন শাসকদের মনস্তুষ্টি এবং পৃষ্ঠপোষকতালাভের লোভে এবং মোহে নির্বিচারে এই 'আর্য' অভিযানের মিথ্যা আমরা গ্রহণ করেছিলাম। স্বাধীনতার পরও গড্ডালিকা প্রবাহে ভাসমান আমরা তার পুনর্মূল্যায়নে এখনো অনীহ। বহুদিন পূর্বে স্বামী বিবেকানন্দ এই বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। অবশ্য এখন দেশে ও বিদেশে এই সম্বন্ধে ইতিহাসের সত্য নিরূপণে আর্য-অভিযানের মিথ্যাত্ব অনেকে প্রমাণ করছেন। কিন্তু আমাদের অলসচিত্ত তাতে এখনও পূর্ণ ভাবে সাড়া দিচ্ছে না।

যা হোক্ ঐ সিন্ধুনদের অববাহিকায় যে প্রাচীনতম সভ্যতা গ'ড়ে উঠেছিল, তার অধিবাসীদের জ্ঞান ও আচরণে সমুন্নতির জন্যই 'আর্য' ব'লে অভিহিত করা হ'ত। গাত্রবর্ণ, আকৃতি, আহার, গোষ্ঠী বা ভৌগোলিক স্থান সন্নিবেশের জন্য নয়। গুণের জন্যই তারা 'আর্য'। আর সেই গুণ বিশ্বের যে কোন প্রান্তের যে কোনো গোষ্ঠীর মধ্যে দেখা গেলে তাকেই 'আর্য' বলা হ'ত এবং হবে। 'আর্য' শব্দের সংস্কৃতে ভাষাগত অর্থে এই ব্যাপ্তিই সূচিত হয়। অন্য কোনো ভাষায় এই 'আর্য' শব্দ নেই। তাই তার অর্থেরও আলোচনা অলক্ষিত। ঐ প্রাচীনতম সভ্যতায় শাস্ত্র অনুসারে সামাজিক শৃঙ্খলা এবং অনুশাসনে মানুষের জীবন পরিচালিত হ'ত। পৃথিবীর সর্বত্রই তাদের শীর্ষস্থানীয়দের আদর্শেই চরিত্র গঠনের স্মৃতিশাস্ত্রে বলা হয়েছে—

'অস্মদ্দেশপ্রসূতস্য সকাশাদ্ অগ্রজন্মনঃ।
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্বমানবাঃ॥'

এই 'আর্য' তথা পরিশীলিতচিত্ত জনগণকেই প্রথমে বিদেশীরা বলতেন ভৌগোলিক কারণে 'হিন্দু'। সিন্ধু এবং তার উপনদী সমূহের দ্বারা বিধৌত ভারতের ঐ উত্তর পশ্চিমাঞ্চল। 'সিন্ধু' শব্দের সংস্কৃত অর্থ যেমন নদীবিশেষ, সমুদ্র, তেমনি আবার যে কোনো স্রোতস্বিনী। ঐ অঞ্চলে সাতটি নদীধারা প্রবাহিত ছিল ব'লে তাকে বলা হ'ত 'সপ্তসিন্ধু'। নদীতীরেই মানুষের জীবন সমৃদ্ধ হয়, সভ্যতার হয় বিকাশ।

ইতিহাসে দেখা গেছে নদীর ধারার পরিবর্তন বা বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তার তীরে গড়ে ওঠা সমৃদ্ধ জনপদ এবং উন্নত সংস্কৃতিও বিলুপ্ত হ'য়ে গেছে। নদীর জলধারার মধ্যেই শোনা যায় সভ্যতার কল-কল্লোল। এই সপ্তসিন্ধুর জলধারাকে বৈদিক ঋষিরা তখন বন্দনা করেছেন প্রাণের মন্ত্রে।—

'ইমা আপঃ শিবতমা ইমা রাষ্ট্রস্য ভেষজাঃ।
ইমা রাষ্ট্রস্য বর্ধনোরিমা রাষ্ট্রভূতোপমাঃ ॥'

এই সিন্ধু ছিল তাঁদের কাছে জাতীয়তা ও সংহতির প্রতীক। এই সিন্ধুনদকে অবলম্বন ক'রে সেদিন ঐ জনপদে জাগ্রত হ'য়েছিল জাতীয় এবং কৃষ্টিগত ঐক্য। ঐ সিন্ধুর নামানুসারে নিজেরা তাঁদের 'সপ্তসিন্ধু' এবং সংক্ষেপে 'সিন্ধু' বলে অভিহিত করতেন। আরব এবং পারস্য দেশের সঙ্গে ভৌগোলিক নৈকট্যের জন্য তাঁদের মধ্যে হ'ত বাণিজ্যিক এবং সাংস্কৃতিক আদান প্রদান। আরবী এবং পারসিক ভাষায় দন্ত্য 'স' কে 'হ' উচ্চারণ করা হয়। তাই পারসীকদের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ **'অবেস্তাতে'** এই ভারতীয় জনগোষ্ঠীকে **'হপ্তহিন্দু'** ব'লে উল্লেখ করা হ'য়েছে। সেই প্রাচীনতম কাল থেকেই এই বৈদিক সভ্যতার অন্তর্গত জনগণ 'হিন্দু' এই ভৌগোলিক অভিপ্রায় বহির্ভারতে পরিচিতি লাভ করে। আর 'হিন্দু' থেকেই গ্রীকভাষায় 'ইন্দু' এবং পরে 'ইণ্ডিয়া' এই শব্দের উদ্ভব। সিন্ধু-হিন্দু-ইন্দু-ইণ্ডিয়া এই হ'ল শব্দের গতি প্রকৃতি। কোনো বিশেষ ধর্মীয় বিশ্বাস এবং আচরণকে নিয়ে নয়। সম্পূর্ণ ভৌগোলিক এবং সাংস্কৃতিক পরিচয়কে অবলম্বন ক'রে 'হিন্দু' শব্দের উদ্ভব এবং স্বদেশে ও বিদেশে তার ব্যবহার। তাই পরবর্তী যুগে 'ভবিষ্যপুরাণে' দেখা যায় এই আর্য তথা সদাচারী ব্যক্তিদের বাসভূমিই হ'ল হিন্দুস্থান—

সিন্ধুস্থানমিতি জ্ঞেয়ং রাষ্ট্রমার্যস্য চ।
ম্লেচ্ছস্থানং পরং সিন্ধোঃ কৃতং তেন মহাত্মনা।'

(ভবিষ্যপুরাণ)

সংস্কৃতস্যৈব বাণী তু ভারতং বর্ষমুহ্যতাম্।
অন্যে খণ্ডে গতা সৈব ম্লেচ্ছা হ্যানন্দিনোহ্ভবন্ ॥
জানু স্থানে জৈন শব্দঃ সপ্তসিন্ধুস্তথৈব চ।
হপ্তহিন্ধুর্যাবনো চ পুনর্জ্ঞেয়া গুরুণ্ডিকা ॥'

(ভবিষ্যপুরাণ—প্রতিসর্গপর্ব-অঃ-৫)

'কুলার্ণবতন্ত্রে' এই হিন্দুস্থানের সীমা নির্দেশ করা হ'য়েছে—

'হিমালয়ং সমারভ্য যাবদিন্দুসরোবরম্।
হিন্দুস্থানমিতি খ্যাতম্ আদ্যন্ত্যাক্ষরযোগতঃ ॥'

'হিমালয় থেকে শুরু করে ভারতসমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগকে হিমালয় শব্দের আদি অক্ষর 'হি' এবং 'ইন্দু' শব্দের অন্ত্য অক্ষর 'ন্দু' কে নিয়ে 'হিন্দু' বলে।'

'বার্হস্পত্য' শাস্ত্রেও এই কথাই বলা হ'চ্ছে—

'হিমালয়ং সমারভ্য যাবদিন্দুসরোবরম্।
তং দেবনির্মিতং দেশং হিন্দুস্থানং প্রচক্ষতে॥'

'হিমালয় থেকে ইন্দু সরোবর পর্যন্ত বিস্তৃত এই দেবনির্মিত দেশকে 'হিন্দুস্থান' বলা হয়।'

এইভাবে দন্ত্য 'স' কে 'হ' উচ্চারণ করার জন্যই পারসীক ভাষায় সরস্বতীকে — 'হরহ্বতী' অসুরকে 'অহুর' বলা হয়। এই 'হিন্দুস্থানকে'ই পরবর্তিকালে রাজা ভরতের নামানুসারে 'ভারতবর্ষ' বলা হচ্ছে। 'বিষ্ণুপুরাণে' এই জনপদকেই 'ভারতবর্ষ' এবং অধিবাসীদের 'ভারতী' ব'লে চিহ্নিত করা হচ্ছে—

উত্তরং যৎ সমুদ্রস্য হিমাদ্রেশ্চৈব দক্ষিণম্।
বর্ষং তদ্ ভারতং নাম, ভারতী যত্র সন্ততিঃ॥'

'বায়ুপুরাণে' এই হিন্দুস্থান তথা ভারতবর্ষের সীমারেখাকে স্পষ্ট ক'রে দিয়ে বলা হয়েছে—

'যোজনানাং সহস্রং তু দ্বীপোহ্য়ং দক্ষিণোত্তরম্।
আয়তো হি কুমারিক্যাদ্ গঙ্গাপ্রভবাচ্চ যঃ॥'

চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ্ 'ভারত' এবং 'হিন্দু' দুইই জানতেন। তবে তিনি ভারতীয় মাত্রকেই 'শিন্টু' তথা 'হিন্দু' নামেই অভিহিত করতেন।

মুক্ত বুদ্ধিতে আলোচনা ক'রলে দেখা যায় 'হিন্দু' এবং 'হিন্দুত্ব' কেবল শব্দমাত্র নয়, একটা প্রাচীন সার্বভৌম পরম্পরার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস, কোনো সাধন পদ্ধতি বা সম্প্রদায় বিশেষের ধর্মের সঙ্গে একার্থক নয়। তাই বর্তমান যুগে বিখ্যাত বিপ্লবী, মনীষী, ঐতিহাসিক এবং আইনজ্ঞ বীর বিনায়ক দামোদর সাভারকর 'হিন্দুর' সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন—

'আ-সিন্ধু-সিন্ধুপর্যন্তা যস্য ভারতভূমিকা।
পিতৃভূঃ পুণ্যভূশ্চৈব স বৈ হিন্দুরিতি স্মৃতঃ॥'

'সিন্ধু নদ হ'তে ভারত মহাসাগর পর্যন্ত প্রসারিত অখণ্ড ভারত ভূমিকে যিনি পুণ্যভূমি এবং পিতৃভূমি মনে করেন তিনিই 'হিন্দু'। এই কারণেই দেখি পাকিস্তান সৃষ্টির অন্যতম চিন্তানায়ক হ'য়েও রাজনীতিক ও কবি স্যার মহম্মদ ইকবাল উর্দুতে দেশবন্দনা করেছেন—

'সারে জাঁহাসে আচ্ছা হিন্দুস্থান হামারা।'

ধর্মের ভিত্তিতে ভারত খণ্ডনের উদ্গাতাও ভারতকে 'হিন্দুস্থান' ব'লেই অভিহিত করছেন। কারণ, এই শব্দ ধর্মীয় গোষ্ঠীবিশেষের পরিচায়ক নয় বলেই। আজও ভারতের বাইরে ভারতীয় সনাতনী, মুসলমান, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ সবাই 'হিন্দু' নামেই পরিচিত। ডঃ মহম্মদ করিম চাগলা, স্যার মির্জা ইসমাইল, ডঃ সৈয়দ মুজতবা

আলী, মৌলবী রেজাউল করিম, মৌলবী আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ প্রমুখ বিশিষ্ট ইসলাম-ধর্মাবলম্বী মনীষীরা নিজেদের সাংস্কৃতিক ভাবে হিন্দু এবং সম্প্রদায়গতভাবে মুসলমান ব'লে আত্মপরিচয় দিতেন। খ্রীষ্টান বিপ্লবী পি. মিত্র, জাতীয় নেতা উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ হরেন্দ্র কুমার মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বিদ্বজ্জনও সাংস্কৃতিক পরিচয়ে হিন্দু ব'লেই নিজেদের চিহ্নিত করতেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এই বিষয়ে বহু দীর্ঘ আলোচনায় ভারতবাসী মাত্রকেই হিন্দু ব'লে ধর্মীয় পরিচয়ে হিন্দুমুসলমান, হিন্দুখ্রীষ্টান, হিন্দুবৈষ্ণব, হিন্দুশাক্ত, হিন্দুব্রাহ্ম, হিন্দুবৌদ্ধ, হিন্দুশিখ, হিন্দুজৈন, হিন্দুনাস্তিক বলার পক্ষপাতী। বিদেশী শিক্ষাজাত অপবুদ্ধিতে যাঁরা নিজেদের 'হিন্দু পরিচয়' সাম্প্রদায়িক মনে ক'রে তুলে দিতে চান তাঁদের প্রতি অসাম্প্রদায়িকতার মূর্তবিগ্রহ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের নিম্নোদ্ধৃত সুচিন্তিত মন্তব্য উল্লেখনীয়—

'দেশের ধর্মস্থানকে, বন্ধুস্থানকে জন্মস্থানকে কৃশ করিয়া কেবল ভোগস্থানকে স্ফীত করিয়া তুলিলে বাহির হইতে মনে হয় যেন দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতে চলিল। সেইজন্য ছদ্মবেশী সর্বনাশই আমাদের পক্ষে অতিশয় ভয়াবহ। মঙ্গল করিবার শক্তিই ধন, বিলাস নহে।'

(রবীন্দ্র রচনাবলী - ১৩শ, পৃঃ-৪৫)

'বর্তমানকালে আমরা কেহ কেহ এই লইয়া চিন্তা করিতে আরম্ভ করিয়াছি,আমরা যে কী সে লইয়া আমাদের মনে একটা সন্দেহ জন্মিয়াছে। আমরা আর কিছু নই, আমরা ব্রাহ্ম। কিন্তু সেটাতো একটা নূতন পরিচয় হইল। সে পরিচয়ের শিকড় তো বেশী দূর যায় না। আমি হয়তো গতকাল ব্রাহ্মসমাজে দীক্ষা লইয়া প্রবেশ করিয়াছি। ইহার চেয়ে পুরাতন ও পাকা পরিচয়ের ভিত্তি আমার কিছু নাই ? অতীত কাল হইতে প্রবাহিত কোনো একটি নিত্যলক্ষণ কি আমার মধ্যে একেবারেই বর্তায় নাই ?

এরূপ কখনো সম্ভব হইতে পারে না। অতীতের লোপ করিয়া দিই এমন সাধ্যই আমার নাই। সুতরাং সেই অতীতের পরিচয় আমার ইচ্ছার উপর লেশমাত্র নির্ভর করিতেছে না।

অতএব আমি হিন্দু একথা বলিতে যদি নিতান্তই কোনো লজ্জার কারণও থাকে, তবে সে লজ্জা আমাকে নিঃশব্দে হজম করিতেই হইবে। কারণ বিধাতার বিরুদ্ধে নালিশ করিতে হইলে সেই আদালতের জজ পাইব কোথায় ?' (ঐ-পৃঃ-১৬৬)

প্রাক স্বাধীন এবং স্বাধীনোত্তর ভারতের কলঙ্ক হিন্দু-মুসলমান বিরোধের সমাধানে 'হিন্দু' নামের উৎসাদন, হিন্দু পরিচয়ের বিলুপ্তিই অনেক অদূরদর্শী ব্যক্তি এবং গোষ্ঠী সহজ পন্থা ব'লে মনে করেন। কিন্তু সেই ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীর অব্যবহিত পূর্বজেরা হিন্দু নামেই পরিচিত ছিলেন। তাঁহাদের অধ্যাত্মসাধনা, সামাজিক আচরণ, আইনের বিধি-বিধান হিন্দু নামেই চিহ্নিত। হিন্দুত্বের অস্বীকৃতি তাঁদের

আত্মপরিচয়েরই বিলোপসাধন, সত্যের অপলাপ এবং গর্হিত অপরাধ। কোনো শ্রীরামকৃষ্ণভক্ত বা বৈষ্ণব বা শিখ বা বৌদ্ধ বা জৈন নিজেকে যদি 'হিন্দু' নই ব'লতে চান তা হবে ভাবের ঘরে চুরি বা আপাত কিছু সুবিধালাভের জন্য নিজের পিতৃ-মাতৃ-বিস্মৃতি। তাঁদের জনক-জননী, তাঁদের অধ্যাত্মগুরু হিন্দু নামেই পরিচিত ছিলেন এবং থাকবেন। সেই হিন্দুত্বের ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে অপরের অনেক কিছু গ্রহণ ক'রলেও তাঁর মৌলিক পরিচয় বিনাশ হয় না। আইনের ক্ষেত্রেও হিন্দু বিবাহ বিধি, হিন্দু উত্তরাধিকার আইনই তিনি মেনে চলেন। না মানলে প্রশাসনের দ্বারা তিনি দণ্ডিত হন। কোনো হিন্দু সন্তান তিনি হিন্দুধর্মের উপর যত বিষোদ্গারই করুন না কেন, একপত্নী থাকতে অন্য পত্নী গ্রহণ করলে তিনি দণ্ডিত হবেনই। আইনের চোখে তিনি হিন্দুই।

আর যাঁরা অপরের তথা মুসলমানের বিরোধ পরিহারের জন্য হিন্দু পরিচয় বিলোপে প্রাগ্রসর, তাঁদের একটি ঐতিহাসিক সত্য মনে রাখা প্রয়োজন। পূর্ববঙ্গে বহু হিন্দু কংগ্রেস, কম্যুনিষ্ট তথা বিরোধী রাজনীতির প্রবক্তা ছিলেন। কিন্তু সেইসব রাজনৈতিক মতবাদের আশ্রয় তাঁদের বিধর্মীদের আক্রমণ হ'তে রক্ষা করতে পারেন নি। **আক্রমণকারীদের কাছে তাঁদের সেইসব অসাম্প্রদায়িক পরিচয় তুচ্ছই হ'য়ে গেছে। হিন্দু ব'লেই তাঁরা আক্রান্ত হয়েছেন, এবং হিন্দুত্ব রক্ষার জন্যই উদ্বাস্তু হ'য়ে খণ্ডিত ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হ'য়েছেন।** শ্রীরামকৃষ্ণভক্ত, বৈষ্ণব বা বৌদ্ধ ব'লে কেউ সেখানে রক্ষা পাননি। তাঁদের সার্বভৌম ঐতিহাসিক পরিচয় হিন্দু ব'লেই তাঁরা আক্রমণকারীদের কাছে বিবেচিত হ'য়েছেন এবং প্রাণরক্ষার তাগিদে স্থানত্যাগ ক'রতে বাধ্য হ'য়েছেন। স্বকীয় পরিচয়ের বিলোপ সাধনের দ্বারা চিরকালের জন্য আত্মরক্ষা করা যায় না।

আর মুষ্টিমেয় মুসলমানাদি ভক্তের মনস্তুষ্টির মোহে নিজের স্বধর্মের কোটি কোটি হিন্দুর সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ সেই ব্যক্তি ও গোষ্ঠীরও ভবিষ্যদ্ বিনাশকেই ত্বরান্বিত করে। মূল কাণ্ড হ'তে শাখা পৃথক্ হ'য়ে গেলে অচিরেই সেটি বিনষ্ট হ'য়ে যায়। প্রশাসনিক এবং দলীয় উচ্ছিষ্টের আপাতমোহে শাশ্বত সত্যের অস্বীকৃতি পরিণামে মহতী বিনষ্টিকেই নিয়ে আসে। তাতে লাভের চেয়ে লোকসানই বেশি। একদা উপচীয়মান বৌদ্ধগোষ্ঠীর মূল উদ্ভবভূমি ভারতে পরবর্তীকালে ক্ষীয়মানতার এটিও একটি কারণ। বাস্তব কারণেই তাঁদের ভাবতে অনুরোধ করি দু'চারজন অন্যধর্মীয়ের মৈত্রীর বিনিময়ে কোটি কোটি স্বধর্মীয় ব্যক্তির সঙ্গে বিচ্ছেদ-রচনা কি তাঁদের অভীষ্ট হবে? তাই সত্য এবং স্বার্থ উভয় দিক্ থেকেই মূল হিন্দু পরিচয়ই তাঁদের সত্য, গৌরব এবং আত্মরক্ষারও প্রধান পন্থা। কিন্তু 'মুসলমান' নামের বিলোপ সাধনের কথা বলার দুঃসাহস তাঁদের কারোরই নেই। এই প্রসঙ্গেও কবিগুরুর অভিমত প্রণিধানযোগ্য—

'হিন্দুর সঙ্গে মুসলমানের যদি বিরোধ থাকে, তবে আমি হিন্দু নই বলিয়া সে বিরোধ মিটাইবার ইচ্ছা করাটা যে অত্যন্ত সহজ পরামর্শ বলিয়া শোনায়, তাহা সত্য পরামর্শ নহে। এই জন্যই সে পরামর্শে সত্যফল পাওয়া যায় না। কারণ আমি 'হিন্দু' নই বলিলে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধটা যেমন তেমনই থাকিয়া যায়, কেবল আমিই তাহা হইতে একলা পাশ কাটাইয়া আসি।' (ঐ পৃঃ- ১৬৭)

মুসলমানদের জন্য পাকিস্তান সৃষ্টির পর সেইসব অঞ্চলে যেই সকল প্রগতিশীল হিন্দু সন্তান নিজেদের 'হিন্দু' পরিচয় বিলোপে আগ্রহী ছিলেন, হিন্দু আচার-বিচার-নীতি-দেবতা মানতেন না, সোচ্চারে তার বিরোধিতা ক'রতেন, তারাও কিন্তু আগ্রাসী মুসলমান জনগণ এবং প্রশাসনের আক্রমণ হ'তে পরিত্রাণ পান নি। তাই, আত্মরক্ষার জন্য হিন্দুপ্রধান ভারতখণ্ডে পালিয়ে এসে পুনরায় হিন্দুত্বের বিরুদ্ধে বিষেদ্গারের সুযোগ পাচ্ছেন।

খণ্ডিত ভারতেও বিবাহ এবং সম্পত্তির উত্তরাধিকার নিয়ে হিন্দু আইনই তাঁদের মানতে হয়। হিন্দু আইনের অধিকার হতে মুক্তির জন্য তাঁরা কখনো ইচ্ছা প্রকাশ করেন নি।

ফলে 'হিন্দু'র বিরুদ্ধে নিন্দাবর্ষণকারী হিন্দুসন্তানেরা আইনগত এবং নীতিগত ভাবে হিন্দুই। 'হিন্দু'-সন্তান ধর্মনিরপেক্ষ হলেও অহিন্দুর আক্রমণ হ'তে যেমন নিস্তার পাননা, তেমনি হিন্দু আইনের বিধানের বাইরেও যেতে পারেন না।

কোনো হিন্দু মন্দিরে তারা, চাঁদ এবং ক্রুশ চিহ্ন অঙ্কিত করে কৃত্রিম অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের আত্মপ্রসাদ অনুভব করেন। কিন্তু কোনো মসজিদ এবং গির্জায় হিন্দু চিহ্ন স্বস্তিক, মঙ্গলঘট বা দেবদেবীর অস্তিত্ব কল্পনাও করা যায় না। বহু হিন্দুগৃহে যীশুর মূর্তি, মক্কার কাবার চিত্র দেখা যায়। কিন্তু কোনো মুসলমান বা খৃষ্টানের গৃহে শংকর-চৈতন্যের আলেখ্য, বারাণসীর চিত্র দেখা যায় কি?

রবীন্দ্রনাথের মতে— **'পৃথিবীতে দুটি ধর্মসম্প্রদায় আছে অন্য সমস্ত ধর্মমতের সঙ্গে যাদের বিরুদ্ধতা অত্যুগ্র — সে হচ্ছে খৃষ্টান আর মুসলমান ধর্ম। তারা নিজের ধর্মকে পালন ক'রেই সন্তুষ্ট নয়, অন্য ধর্মকে সংহার ক'রতে উদ্যত।'**

(কালান্তর-হিন্দু-মুসলমান-- র.র. ৯ম খণ্ড পৃ--৩৫৬)

সত্যের জন্য নয়, রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষণ এবং লঘু জনপ্রিয়তার আপাতলোভে কোনো বিখ্যাত ও অখ্যাত ধর্মপ্রতিষ্ঠান এবং কিছু কিছু চমকসৃষ্টিকারী তথাকথিত ধর্মনেতা বা গুরু নিজেদের 'হিন্দু' পরিচয় পরিত্যাগে বর্তমানে উন্মুখ। মন্দির, মসজিদ, গীর্জার অযৌক্তিক একীকরণের এবং সকল ধর্মপথের বিসদৃশ মিলনের উচ্চকিত আহ্বানে তাঁরা উদগ্র। অবশ্য কোনো মুসলমান বা খ্রীষ্টান ধর্মনেতার এবম্বিধ উৎকট প্রয়াস দেখা যায় না। মসজিদ এবং গীর্জার চত্বরে ঈদৃশ কর্মসাধনা অকল্পনীয়। কিন্তু ঔদার্যের নামে আত্মবিলোপে অগ্রগামী, তুলনামূলক ভাবে

ক্রমক্ষীয়মান হিন্দুসমাজের মধ্য থেকেই আসে এই অপকর্মের নেতৃত্ব। এক সময় ব্রাহ্মসমাজের প্রগতিশীল এক অংশ যখন নিজেদের এবং রাজা রামমোহনকে হিন্দু ব'লতে কুণ্ঠিত হচ্ছিল, তখন সত্যদ্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ যুক্তির দ্বারা মহাত্মা রামমোহনকে নিজেকে এবং সনাতনী সংস্কার মুক্ত ব্রাহ্মসমাজকে হিন্দু ব'লেই প্রতিপাদন করেছেন—

'একথা কোনোমতেই বলিতে পারিব না যে তিনি (রামমোহন) হিন্দু নহেন। কেননা, অন্যান্য অনেক হিন্দু তাঁহার চেয়ে অনেক নীচে ছিল এবং নীচে থাকিয়া তাঁহাকে গালি পাড়িয়াছে। কেন, বলিতে পারিব না? কেননা একথা সত্য নহে। কেননা তিনি যে নিশ্চিতই হিন্দু ছিলেন — অতএব তাঁহার মহত্ত্ব হইতে কখনোই হিন্দু সমাজ বঞ্চিত হইতে পারিবে না— হিন্দু সমাজের বহু শত লক্ষ লোক যদি এক হইয়া স্বয়ং এজন্য বিধাতার কাছে দরখাস্ত করে তথাপি পারিবে না। শেক্সপীয়ার, নিউটনের প্রতিভা অসাধারণ হইলে, তাহা যেমন সাধারণ ইংরেজের সামগ্রী তেমনি রামমোহনের মত যদি সত্য হয় তবে তাহা সাধারণ হিন্দু সমাজেরই সত্য মত।

বস্তুতঃ, ব্রাহ্মসমাজের আবির্ভাব সমস্ত হিন্দু সমাজেরই ইতিহাসের একটি অঙ্গ। হিন্দু সমাজেরই নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে তাহারই একটি বিশেষ প্রয়োজনবোধের ভিতর দিয়া তাহারই আন্তরিক শক্তির উদ্যমে এই সমাজ উদ্‌বোধিত হইয়াছে।' (ঐ-পৃঃ-১৭১)

'ব্রাহ্মসমাজকে তাই আমি হিন্দুসমাজের ইতিহাসের একটি স্বাভাবিক বিকাশ বলিয়া দেখি। এই বিকাশ হিন্দু সমাজের একটি বিশ্বজনীন বিকাশ।'

(ঐ-পৃঃ–১৭২)

'হিন্দু সমাজের কর্তব্য কি? যাহা ধর্ম তাহাই পালন করা। অর্থাৎ যাহাতে সকলের মঙ্গল তাহারই অনুষ্ঠান করা। (ঐ-পৃঃ–১৭৩)

বৌদ্ধ, জৈন, শিখের ক্ষেত্রেও এই কথাই সত্য। হিন্দু যে ধর্মীয় সম্প্রদায়মাত্র নয়, রাষ্ট্রীয় সর্বস্পর্শী জাতীয়তার পরিচয় চিহ্ন, এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মত স্পষ্ট। তিনি বলেছেন—

'তবে কি মুসলমান অথবা খৃষ্টান সম্প্রদায়ে যোগ দিলেও তুমি হিন্দু থাকিতে পার? নিশ্চয়ই পারি। ইহার মধ্যে পারাপারির তর্ক মাত্রই নাই। হিন্দু সমাজের লোকেরা কি বলে সে কথায় কান দিতে আমরা বাধ্য নই। কিন্তু ইহা সত্য যে কালীচরণ বাঁড়ুজো মশাই হিন্দুখ্রীষ্টান ছিলেন, তাঁহার পূর্বে কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায় হিন্দুখ্রীষ্টান ছিলেন। অর্থাৎ তাঁহারা জাতিতে হিন্দু ধর্মে খৃষ্টান। খৃষ্টান তাঁহাদের রঙ, হিন্দুই তাঁহাদের বস্তু। বাংলাদেশে হাজার হাজার মুসলমান আছে, হিন্দুরা অহর্নিশি তাহাদিগকে হিন্দু নও হিন্দু নও বলিয়াছে এবং তাহারাও নিজদিগকে হিন্দু নই হিন্দু

নই শুনাইয়া আসিয়াছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাহারা প্রকৃতই হিন্দু-মুসলমান। হিন্দু শব্দে এবং মুসলমান শব্দে একই পর্যায়ের পরিচয়কে বুঝায় না।

(ঐ পৃঃ - ১৮৪)

হিন্দুর স্বরূপ সম্বন্ধে তাঁর বিশ্লেষণ—

'মুসলমান একটি বিশেষ ধর্ম, কিন্তু হিন্দু কোনো বিশেষ ধর্ম নহে। কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি জাতিগত পরিণাম। ইহা মানুষের শরীর, মন হৃদয়ের নানা বিচিত্র ব্যাপারকে বহু সুদূর শতাব্দী হইতে এক আকাশ, এক আলোক, এক ভৌগোলিক নদ-নদী-অরণ্য-পর্বতের মধ্য দিয়া অন্তর ও বাহিরের বহুবিধ ঘাত প্রতিঘাত পরম্পরায় একই ইতিহাসের ধারা দিয়া আজ আমাদের মধ্যে আসিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছে।.......

সমস্ত বাঁধাবাঁধির মধ্যেও হিন্দুসমাজ একপ্রকার অর্ধচেতনভাবে অনুভব করিতে পারে যে, বাহিরের এই সমস্ত পরিবর্তন হাজার হইলেও তবু বাহিরের, যথার্থ হিন্দুত্বের সীমাটুকুর মধ্যে কখনোই বদ্ধ নহে।" (ঐ পৃঃ—১৭৫)

ইতিহাসের ধারাপথে হিন্দুত্বের যুগযুগব্যাপী বহুধারাব্যাপ্ত সর্বানুভূত স্বরূপ সম্বন্ধে তাঁহার সুচিন্তিত ব্যাখ্যা অনুধাবনীয়—

"জগতে হিন্দুজাতির জাতীয়ত্বের বন্ধন যেমন কঠিন, তেমনি শিথিল, ইহার সীমা যেমন দৃঢ়, তেমনি অনির্দিষ্ট।

'য়ুরোপে জাতিগত উপাদানে রাজনৈতিক ঐক্যই সর্বপ্রধান। হিন্দুদের মধ্যে সেটা কোনকালেই ছিল না বলিয়া যে হিন্দুরা জাতিবদ্ধ নহে সেকথা ঠিক নহে।

বৈদিক সময় হইতে পৌরাণিক যুগ পর্যন্ত সুদীর্ঘ কাল ধরিয়া শাস্ত্র এবং সংস্কার, আচার এবং অনুশাসন হিন্দুদিগের জন্য এক বিরাট বিস্তৃত আবাস ভবন নির্মাণ করিয়াছে। তাহার সকল কক্ষগুলি সমান নহে -- মাঝে মাঝে দেয়াল উঠিয়া তাহার ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের মধ্যে যাতায়াতের পথ রুদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু তথাপি এই বিপুলতার মধ্যে একটা বৃহৎ ঐক্য আছে। (ঐ-পৃঃ-২৯)

'হিন্দুত্বের মধ্যে বিসদৃশ জাতি পরম্পরা যেমন একত্র মিশ্রিত হইয়াছে, জগতে এমন আর কুত্রাপি ঘটে নাই। (ঐ-পৃঃ—৩০)

হিন্দুত্বের ধ্বংস নয় হিন্দুকে সংগঠিত এবং ঐক্যবদ্ধ করাই হল যুগের প্রয়োজন। তিনি বলছেন—

'এক্ষণে যিনি জড়ীভূত হিন্দু জাতির মধ্যে আচারে ব্যবহারে সমাজে ধর্মে আর্যভাবের একটি বিশুদ্ধ আদর্শ স্থাপন এবং কৃত্রিম ক্ষুদ্র নিরর্থক বিচ্ছেদগুলি দূর করিয়া সমগ্র লোকস্তূপের মধ্যে একটি সজীব ঐক্য সঞ্চার করিয়া দিবেন তিনিই ভারতবর্ষের বর্তমানকালের মহাপুরুষ।' (ঐ-পৃঃ—৩০)

'কিন্তু এ ধূলা কাটিয়া যাইবে, আমাদের নিঃশ্বাস বায়ু বিশুদ্ধ হইবে, আমাদের চারিদিকের দৃশ্য উদ্‌ঘাটিত হইবে, সন্দেহ মাত্র নাই। আমাদের দেশের যাহা স্থায়ী, যাহা সারবস্তু, যাহা গভীর, যাহা আমাদের সকলের ঐক্যবন্ধনের উপায়, তাহাই ক্রমে প্রকাশিত হইয়া পড়িবে।'

'আমাদের সংস্কার ও শিক্ষা এত দীর্ঘকালের তাহা আমাদিগকে এমন জটিল, বিচিত্র ও সুদৃঢ়ভাবে জড়িত করিয়া রাখিয়াছে যে, বৃহৎ জাতিকে চিরকালের মতো তাহার বাহিরে লইয়া যাওয়া কাহারো সাধ্যায়ত্ত নহে। সেই চিরোদ্‌ভিন্ন ভারতবর্ষীয় প্রকৃতির মধ্য হইতেই আমাদের অভ্যুত্থানের উপাদান সংগ্রহ করিতে হইবে। আমরা ধূমকেতুর মতো দুই চারিজন মাত্র গর্ববিস্ফারিত পুচ্ছে লঘুবেগে সাহেবিয়ানার দিকে ছিটকাইয়া যাইতে পারি, কিন্তু সমস্ত দেশের পক্ষে তেমন লঘুত্ব সম্ভবপর নহে।' (ঐ-পৃঃ — ৩১, ৩২)

'যেমন করিয়া হউক, আমাদের হিন্দু সমাজের সমস্ত গ্রন্থি যদি শিথিল হইয়া যায়, তবে ইহা নিশ্চয় যে, বহু সহস্র বৎসরে হিন্দু জাতি যে অটল আশ্রয়ে বহু ঝড়-ঝঞ্ঝা কাটাইয়া আসিয়াছে, তাহা নষ্ট হইয়া যাইবে। ইহার স্থানে নূতন আর কিছু গড়িয়া উঠিবে কিনা; উঠিলেও তাহা আমাদিগকে কিরূপ নির্ভর দিতে পারিবে তাহা আমরা জানি না। এমন স্থলে আমাদের যাহা আছে, নিশ্চিন্ত মনে তাহার বিনাশ দশা দেখিতে পারিব না।' (রবীন্দ্র রচনাবলী ১৩শ খণ্ড পৃঃ — ৪২)

কবিগুরুর মতে হিন্দুত্বের পরিচয় হল — 'সমাজের শিক্ষাদান, স্বাস্থ্যদান, অন্নদান, ধনসম্পদদান, ইহা আমাদের নিজের কর্ম। ইহাতেই আমাদের মঙ্গল .... ইহাই যজ্ঞ, ইহাই ব্রহ্মের সহিত কর্মযোগ, এই কথা নিয়ত স্মরণ করা, ইহাই হিন্দুত্ব। স্বার্থের আদর্শকেই মানব সমাজের কেন্দ্রস্থলে না স্থাপন করিয়া, ব্রহ্মের মধ্যে মানব সমাজকে নিরীক্ষণ করা, ইহাই হিন্দুত্ব।"

(আত্মশক্তি ও সমূহ — র.র. পৃঃ ৬৮০)

তাঁর আশা — "হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, খৃষ্টান ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে পরস্পর লড়াই করিয়া মরিবেনা — এইখানে তাহারা সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাইবে। সেই সামঞ্জস্য "অহিন্দু" হইবে না। তাহা বিশেষভাবে হিন্দু, তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যতই দেশবিদেশের হউক, তাহার প্রাণ, তাহার আত্মা ভারতবর্ষের।" (ঐ — পৃষ্ঠা — ৭০২)

যীশুখ্রীষ্ট কিম্বা মহম্মদের মতো কোনো পুরুষ বিশেষের দ্বারা হিন্দুধর্ম গঠিত নয় বলেই "অপৌরুষেয়"। মহাসমুদ্রের মতো বহু যুগের বহু সাধনার মিলনে হিন্দুত্বের বিকাশ। খ্রীষ্টান, মুসলমান বা নিরীশ্বরবাদী কম্যুনিজমের ন্যায় অপর সকল মত এবং পথকে অস্বীকার এবং বিনাশ ক'রে একটিরই প্রতিষ্ঠার অন্ধ ঔদ্ধত্য হিন্দুর নেই। আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন 'ভারতের সংস্কৃতি' গ্রন্থে হিন্দু এবং ভারতীয়ত্ব যে একই অর্থ বহন করে এবং তা যে বহুর সমন্বিত রূপ প্রমাণ করে বলছেন—

"ইহলোক নিয়ে সাধনা হল সংস্কৃতি, অনন্ত লোক নিয়ে সাধনা হল ধর্ম। ভারতের সংস্কৃতি ও ধর্ম দুইয়ের মধ্যেই অনেক যুগের অনেক মানব মণ্ডলীর নানা দান মিলে মিশে আছে। সংস্কৃতি হতেও ধর্মেই প্রবর্তকদের পরিচয় সহজে পাওয়া যায়; তাতেও দেখা যায় ভারতের হিন্দুধর্ম কোনো বিশেষ যুগে কোনো বিশেষ মহাপুরুষের দ্বারা প্রবর্তিত হয়নি। সেইজন্য হিন্দুধর্মকে এক হিসাবে অপৌরুষেয় ধর্ম বলা যেতে পারে। ভারতে যত সংস্কৃতি বা ধর্ম এসেছে সবার দান একত্র মিলিত হয়েছে যে ধর্মে, তাকে কোনো ব্যক্তিবিশেষের প্রবর্তিত ধর্ম না বলে তার জন্মভূমির ভৌগোলিক নামে তাকে 'ভারতীয় ধর্ম' বলাই সঙ্গত। ভারতকে 'হিন্দ' বলে। তাই এই দেশের সর্ব সংস্কৃতির সমন্বয়ে বিধাতার নির্দেশে যে ধর্মটি যুগের পর যুগের সাধনায় গ'ড়ে উঠেছে তাকে হিন্দের অর্থাৎ ভারতের "হিন্দু" অর্থাৎ ভারতীয় ধর্ম বলাই ঠিক"। (পৃষ্ঠা - ৬)

দার্শনিক রাষ্ট্রপতি ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন্ ১৯২৬ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় The Hindu View of Life ভাষণমালায় আরো বিশদ ক'রে বলছেন—

The Hindu thinker readily admits other points of view than his own and considers them to be just as worthy of attention .... Hinduism is not a definite dogmatic creed, but a vast complex but subtly unified mass of spiritual thought and realization. *(Page – 16,17)*

প্রেম, ধর্ম এবং সেবার বলিষ্ঠ প্রবর্তক স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৭তে লাহোর ভাষণে দৃপ্তকণ্ঠে বলেছেন—

"We are Hindus......It has been one of the principles of my life not to be ashamed of my own ancestors. I am one of the proudest men ever-born, but let me tell you frankly, it is not for myself, but on account of my ancestry. The more I have studied the past, the more I have looked back, more and more has this pride come to me, and it has given me strength and courage of conviction, raised me up from the dust of the earth, and set me working out that great plan laid out by those great ancestors of ours..... Wave after wave of barbarism conquest has rolled over the devoted land of ours. 'Alla-Ho-Akbar !' has sent the skies for hundreds of years, and no Hindu knew what moment would be his last. This is the most suffering and the most subjugated of all the historic lands of the world, yet we still stand practically

same race, ready to face difficulties again and again, if necessary, and not only so, of late there have been signs that we are not only strong, but ready to go out, for the sign of life is expansion." *(Hinduism — 32, 33,34)*

পশ্চিমী বস্তুবাদের অনুকরণে অধ্যাত্মকেন্দ্রিক হিন্দুত্বের অপসারণ ক'রে যাঁরা জাতীয় প্রগতির প্রয়াসে নিরত তাঁদের উদ্দেশ্য বাস্তববাদী ঐতিহাসিক দৃষ্টিসম্পন্ন স্বামীজীর বাণী—

".......There is not regeneration for India until you be spiritual, not only so but upon it depends the welfare of the whole worla. For I must tell you frankly that the very foundations of western civilisation have been shaken to their base. The mightiest buildings, if built upon the loose sand foundations of materialism, must come to grief one day, must totter to their destruction ..... Imitation is not civilisation.

......When a man has begun to be ashamed of his ancestors, the end has come. Here am I, one of the least of the Hindu race, get proud of my race, proud of my ancestors. I am proud to call myself a Hindu." *(Do– P– 44–46)*

বেশভূষা,পান আহার এবং আচরণের শাস্ত্রীয় অনুশাসন ত্যাগ করে হিন্দুত্বের বন্ধনমুক্ত কিংবা অলীক হিন্দু যাঁরা হতে চান, তাঁদের উদ্দেশ্যে বিশ্বনাগরিক স্বামীজীর নির্দেশ—

"Do not be dragged way out of this Indian life ; do not for a moment think that it would be better for India if all the Indians dressed, ate and behaved like another race, ... I have come to the conclusion that the insistance which we make now about eating and drinking is most curious and is just going against what the Shastras required that is to say, we come to grief neglecting the proper purity of the food we eat and drink ; we have lost the true spirit of it." *(Do-P-46)*

বিশ্বসভ্যতায় হিন্দু ধর্মেরই বাণী শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থিতি। বৈচিত্র্যেই সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য ও মাহাত্ম্য। প্রলয়ে যখন সবই ডুবে যায় তখন হয় নিরবচ্ছিন্ন একাকার। হিন্দু এই বৈজ্ঞানিক সত্যকে স্বীকার করে। "একো দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ' — একই

পরম দেবতা সর্বত্রই বিরাজ করছেন — হিন্দুর প্রত্যয়। তাই, হিন্দু যার সঙ্গে মেলেনা তাকেও শুধু বাঁচার নয়, পূজনীয়ের অধিকারও দান করে। হিন্দু জীবনের নিত্য করণীয় আচরণ পঞ্চ মহাযজ্ঞ। তাতে পিতৃযজ্ঞ তথা তর্পণে ধর্মে রতদের সঙ্গে পাপে নিরতদের জন্যও জলের অঞ্জলি প্রদান করা হয়। শুধু এই জন্মের নয়, জন্ম-জন্মান্তরের শত্রুর তৃপ্তি সাধনেও করা হয় তর্পণ—

'দেবা যক্ষাস্তথা নাগা.........
নিরাহারাশ্চ যে জীবা পাপে ধর্মেরতাশ্চ যে।
তেষামাপ্যায়নায়ৈতদ্ দীয়তে সলিলং ময়া॥
'অতীতকুলকোটীনাং সপ্তদ্বীপনিবাসিনাং
ময়া দত্তেন তোয়েন তৃপ্যন্তু ভুবনত্রয়ম্।
যে বান্ধবা অবান্ধবা চ যে অন্যজন্মনি বান্ধবাঃ
তে তৃপ্তিমখিলাং যান্তু যে চাস্মৎতোয়কাঙ্ক্ষিণঃ॥'

নৃযজ্ঞে নিত্য অপরিচিত মানুষকে অন্নদান ক'রে হিন্দু গৃহীকে অন্ন গ্রহণ করতে হয়। ভূতযজ্ঞে পশু পক্ষীকেও আত্মীয় বোধে অন্নদানের এবং পরিচর্যার অনুশাসন হিন্দু জীবনে পালনীয়। হিন্দু বৈজ্ঞানিক কারণে আত্মরক্ষা এবং অপরের কল্যাণের জন্য স্পৃশ্যাস্পৃশ্য বিচার করে, সামাজিক শৃঙ্খলার জন্য জাতিবিন্যাসে সমাজকে বিন্যস্ত করে। উচ্চনীচ বহিরাগত সকলকে একটি শৃঙ্খলার মধ্যে সমন্বিত করে। অজ্ঞানতা এবং ক্ষুদ্র স্বার্থবুদ্ধির জন্য বিকৃতি কোথাও কোথাও হয়েছে সত্য কিন্তু স্বীয়মতের এবং পথের বাইরের লোককে নিষ্ঠুরভাবে ধ্বংসের কথা হিন্দু বলে নি। তাই যে গোদুগ্ধে মানব জীবনধারণ করে, যে বৃষের সেবায় অন্নের চাষ করে, তাকে হত্যা ক'রে তার মাংসভোজনে হিন্দু রাজী হয়নি। চতুর্থবর্ণ শূদ্র এবং পঞ্চমবর্ণকে নানা হীন আচরণের জন্য নানা অধিকার হ'তে বঞ্চিত ক'রেছে, কিন্তু হত্যা কখনো করেনি। সদাচারে দীক্ষিত ক'রে তাদের আত্মজনরূপে গ্রহণের ও প্রচারের ইতিহাসও আমরা দেখি। হিন্দু রাজত্বের অবসানে সেই প্রথা স্তব্ধ হ'য়ে গেল। পার্শী এবং ইহুদীরা পৃথিবীর সব দেশেই নির্যাতিত হ'য়েছে, নিজেদের উৎসভূমি হ'তে নিষ্ঠুরভাবে বিতাড়িত হ'য়েছে। কেবল ভারতের হিন্দু রাজারা এবং হিন্দু জনসাধারণ তাদের নিরাপদে আশ্রয় দিয়েছে, স্বধর্মরক্ষায় আনুকূল্য ক'রেছে। ইতিহাসে হিন্দুত্বের এই ঔদার্যের সংবাদ স্মরণ করা প্রয়োজন।

অধ্যাত্ম সাধনার পথে রুচি, সামর্থ্য, সংস্কার অনুসারে বিভিন্ন পথের প্রতি মর্যাদা দান একমাত্র হিন্দুরই বৈশিষ্ট্য। গীতায় 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্' — 'যে যেভাবেই আন্তরিকতার সঙ্গে ভজনা করুক সে আমাকে পাবেই' — 'শিবমহিম্নস্তোত্রের' — 'রুচীনাং বৈচিত্র্যাদ্ ঋজুকুটিল-নানাপথজুষাং নৃণামেকো

গম্যাস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব' — জলধারা সমূহ সরল এবং কুটিল যে পথেই প্রবাহিত হোকনা কেন, পরিণামে সমুদ্রে পৌঁছে যাবেই। তেমনি সকল সাধনার ধারাই পরিণামে ভগবানের চরণে নিয়ে যাবে, কোন সাধনপথই ব্যর্থ নয়' — হিন্দুর বিশ্বাস।

পক্ষান্তরে ইসলাম মনে করে ঐ পথের যারা পথিক নয় তারা তো কাফের, নরকগামী। ইসলামের উদ্ভবের যুগ হ'তে আজ পর্যন্ত সেই ইতিহাস নির্বিচারে চ'লেছে। ক্যালিফোর্ণিয়ায় স্বামীজীর ভাষণ এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় —

'Now the Mahamedans are the crudest in this respect, and the most sectarian. Their watchword is, 'There is one god and Mahammad is his prophet.' Everything beyond that not only is bad, but must be destroyed forthwith ; at a moment's notice, every man or woman who does not exactly believe in that must be killed ; everything that does not belong to this worship must be immediately broken ; every book that teaches anything else must be burnt. From the pacific to the Atlantic, for five hundred years blood ran all over the world. That is Mohamdenism.'

(The Complete Work of Swami Vivekananda Vol-IV)

বিশ্বের কোনো মুসলমানপ্রধান রাষ্ট্রে বর্তমান বিংশ শতাব্দীতেও অপর ধর্মাবলম্বীর ধর্মাচরণের স্বাধীনতা নেই। মুসলমান ব্যতীত অন্যধর্মাবলম্বী যত যোগ্য ব্যক্তিই হোন্ না কেন, রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, প্রধান সেনাপতি, প্রধান বিচারপতি হ'তে পারবেন না। গণতন্ত্রের কোন স্থান বিশ্বের কোন মুসলমান রাষ্ট্রেই নেই। অপরের প্রতি নিষ্ঠুরতা পরিণামে নিজেদেরও নানা গোষ্ঠীর মধ্যে হিংস্র বিদ্বেষ প্রসার লাভ ক'রে প্রতিটি ইসলামী রাষ্ট্রকে স্বৈরতান্ত্রিক ও গোষ্ঠীকেন্দ্রিক ক'রে তুলেছে। ইরাক, ইরাণ, সৌদি আরব, মিসর, আফগানিস্তান, পশ্চিম-পাকিস্তান, পূর্ব-পাকিস্তান প্রভৃতি প্রতিটি রাজ্যে সংখ্যালঘুরা তো নির্যাতিতই, আবার নিজেরাও গোষ্ঠীহত্যার দ্বারা যুযুধান।

ইসলাম নারীর মধ্যে আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসী নয়। তাই যে কোনো বিক্ষোভে পরধর্মের নারীনির্যাতনে তাঁরা সর্বদাই উদ্যত। কাশ্মীরের হজরতবাল মসজিদ হ'তে পয়গম্বরের পবিত্র কেশগুচ্ছ জনৈক মুসলমান অপহরণ করেন। তার প্রতিবাদেও পূর্ববঙ্গে লক্ষাধিক নারীর উপর ধর্ষণ, নির্যাতন এবং হত্যার অভিশাপ নেমে আসে। এখনো শুধু বাংলাদেশের নয় ভারতেরও মুসলিম গরিষ্ঠ অঞ্চলে হিন্দুনারী-হরণ স্বাভাবিক ঘটনা। মুসলীম লীগের 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান' আন্দোলনে, তার পূর্বে ও

পরে এবং পূর্ববঙ্গের সাম্প্রতিক স্বাধীনতা আন্দোলনে নির্বিচারে নারীহরণ ও ধর্ষণ ঐতিহাসিক ঘটনা। আশ্চর্যের কথা, মুসলমান সমাজের ধর্মীয় নেতৃমণ্ডলী, সমাজনেতা, শিক্ষিত ও সংস্কৃতিমনা আধুনিক সজ্জন ও মাতৃমণ্ডলী এবং সকল রাজনৈতিক দলেরই মুসলমান সদস্য ও নেতৃগণকে হিন্দু নারীহরণ বিষয়ে সংঘবদ্ধ প্রতিরোধে শুধু নয়, প্রতিবাদেও কখনও দেখা গেল না। ভারতে মুসলমান আক্রমণের যুগ হ'তে আজ পর্যন্ত এই একই চিত্র। পূর্ববঙ্গে শুধু নয় খণ্ডিত ভারতেও মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চলে মুসলমান কর্তৃক হিন্দু-নারীহরণ নিয়মিত ঘটনা। আশ্চর্যের বিষয়, সেই নারীহরণকারীকে যদি বিচারালয় ক্বচিৎ কদাচিৎ শাস্তি দিতে যায়, তখন দল-মত-নির্বিশেষে শত শত মুসলমান আদালত অবরোধ করেন। পরনারী-অপহরণকারী দুষ্কৃতদের শুধু আশ্রয়, প্রশ্রয় নয়, অভিনন্দিত করা হয়। পক্ষান্তরে হিন্দু যদি কখনো মুসলমান নারীহরণ করে তাকে সমাজ পরিত্যাগ করে, ধিক্কার দেয়। পরনারীহরণকারীকে অভিনন্দিত করে যে গোষ্ঠী, আর সেই অপরাধীকে সমাজচ্যুত করে যে গোষ্ঠী — উভয়কেই তুল্যমূল্য মনে করা অবিচার নয় কি? পরিতাপের বিষয়, হিন্দুনারীহরণকারী মুসলমান যদি কোন রাজনৈতিক দলের ছত্রচ্ছায়ায় আশ্রয় নেয়, তখন ভোটের লোভে হিন্দু রাজনৈতিক নেতৃমণ্ডলীও সেই দুষ্কৃতকারীকেই মুক্ত করার জন্য হ'য়ে ওঠেন উদগ্র। অপরাধীকে পোষণ, এবং তার বিরোধীকে সাম্প্রদায়িকতার দোষে অভিযুক্ত করায় তাঁরা তখন নির্বিবেক। অনেক সময় দেখেছি প্রশাসনও দুষ্কৃতকারীর প্রতি অতিরিক্ত উদার ও দুর্গতের দুঃখে অনীহ এবং নীরব দ্রষ্টা। চিতোরের জহর ব্রতে হাজার হাজার নারী মুসলমানের হাতে সতীত্ব হানির আশঙ্কায় জ্বলন্ত অগ্নিতে আত্মাহুতি দিয়েছিলেন। ইসলাম ধর্মের অনুশীলনে গভীরভাবে প্রবিষ্ট রাজা রামমোহন ফরাসী ভাষায় 'তুহফাৎ-উল-মুওয়াহিদ্দীন' — 'একেশ্বরবাদীদের উদ্দেশ্যে নিবেদন' গ্রন্থে লিখেছেন —

ইসলামীদের হাতে অনেক পীড়ন ও নির্যাতন সহ্য ক'রেও, এমনকি প্রাণনাশের ভীতিপ্রদর্শন সত্ত্বেও এই সব দৈববিধানে বিশ্বাসী ব্রাহ্মণসমাজের লোকেরা তাদের ধর্মমত বর্জন করেনি।

অন্যদিকে ইসলামধর্মীরা কোরাণের দুটি আয়াত অনুযায়ী "পৌত্তলিকদের যেখানেই পাও হত্যা কর" এবং তারপর ধর্মযুদ্ধে তাদের বন্দী ক'রে হয় বশ্যতার অঙ্গীকার, নয়তো মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দাও" — ঈশ্বরের দোহাই দেয় এই ব'লে যে বহু দেবদেবতায় বিশ্বাসী পৌত্তলিকদের হত্যা বা নির্যাতন করা ঈশ্বর-নির্দেশে আবশ্যিক। সুতরাং ইসলামধর্মীরা ধর্মীয় উন্মাদনা ও ঈশ্বরের নির্দেশ পালনে তাদের অত্যুৎসাহিতায় ইহজগৎ ও পরজগতের আশীর্বাদস্বরূপ ধর্মগুরুকুলশ্রেষ্ঠ মোহম্মদের সর্বশেষ দৌত্যে যাঁরা অবিশ্বাসী সেই পৌত্তলিকদের হত্যা ও নির্যাতন ক'রতে একান্ত

বা সেকালে কখনই বিরত হয়নি"।

(রামমোহন স্মরণে—পৃ—৩১, রা,রা, স্মৃতি, স,)

মুক্তবুদ্ধি, ঔপন্যাসিক, সাহিত্যে নারীর মর্মবেদনার উদ্‌গাতা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের এই বিষয়ে মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য—

"বস্তুতঃ এমন ঘুষ দিয়া, প্রলোভন দেখাইয়া, পিঠ চাপড়াইয়া কি স্বদেশের মুক্তি সংগ্রামে লোক ভর্তি করা যায়, না করিলেই বিজয়লাভ হয়? হয় না, এবং কোনদিন হইবে বলিয়াও মনে করি না।

একদিন মুসলমান লুন্ঠনের জন্য ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল, রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য আসে নাই। সেদিন কেবল লুঠ করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, মন্দির ধ্বংস করিয়াছে, নারীর সতীত্ব হানি করিয়াছে, বস্তুতঃ অপরের ধর্ম ও মনুষ্যত্বের উপর যতখানি আঘাত ও অপমান করা যায়, কোথাও কোন সংকোচ মানে নাই।

দেশের রাজা হইয়াও তাহারা এই জঘন্য প্রবৃত্তির হাত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে নাই। ঔরঙ্গজেব প্রভৃতি নামজাদা সম্রাটের কথা ছাড়িয়া দিয়াও যে আকবর বাদশাহের উদার বলিয়া এত খ্যাতি ছিল, তিনিও কসুর করেন নাই নারীহরণ ব্যাপারে। সংবাদপত্রওয়ালারা প্রায়ই দেখি প্রশ্ন করেন মুসলমান নেতারা নীরব কেন? তাহাদের সম্প্রদায়ের লোকেরা যে পুনঃ পুনঃ এতবড় অপরাধ করিতেছে, তথাপি প্রতিবাদ করিতেছেন না কিসের জন্য? মুখ বুজিয়া নিঃশব্দ থাকার অর্থ কি? কিন্তু আমার মনে হয় অর্থ অতিশয় প্রাঞ্জল। তাঁহারা শুধু বিনয়বশতঃই মুখ ফুটিয়া বলিতে পারেন না, বাপু আপত্তি করিব কি, সময় ও সুযোগ পেলে ওকাজে আমরাও লেগে যেতে পারি।....

অতএব, হিন্দুর সমস্যা এ নয় যে, কি করিয়া অস্বাভাবিক মিলন সংঘটিত হইবে; হিন্দুর সমস্যা এই যে কি করিয়া তাহারা সংঘবদ্ধ হইতে পারিবেন। আর সর্ব্বাপেক্ষা বড় সমস্যা হিন্দুর অন্তরের সত্য কেমন করিয়া তাহার প্রতিদিনের প্রকাশ্য আচরণে পুষ্পের মত বিকশিত হইয়া উঠিবার সুযোগ পাইবে। যাহা ভাবি তাহা বলিনা, যাহা বলি তাহা করি না, যাহা করি তাহা স্বীকার পাই না — আত্মার এতবড় দুর্গতি অব্যাহত থাকিতে সমাজগাত্রের অসংখ্য ছিদ্রপথ ভগবান স্বয়ং আসিয়াও রুদ্ধ করিতে পারিবেন না।

ইহাই সমস্যা, ইহাই কর্তব্য। হিন্দু মুসলমানের মিলন হইল না, বলিয়া বুক চাপড়াইয়া কাঁদিয়া বেড়ানই কাজ নয়। নিজের কান্না বন্ধ-করিলেই তবে অন্যপক্ষ হইতে কাঁদিবার লোক পাওয়া যাইবে।

হিন্দুস্থান হিন্দুর দেশ। সুতরাং এ দেশকে অধীনতার শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিবার দায়িত্ব একা হিন্দুরই। মুসলমানরা মুখ ফিরাইয়া আছে তুরস্ক ও আরবের

দিকে — এদেশে চিত্ত তাহাদের নাই। যাহা নাই তাহার জন্য আক্ষেপ করিয়াই বা লাভ কি; এবং তাহাদের বিমুখ কর্ণের পিছু পিছু ভারতের জলবায়ু বা খাািনকটা মাটির দোহাই পাড়িয়াই বা কি হইবে। আজ এই কথাটিই একান্ত করিয়া বুঝিবার প্রয়োজন হইয়াছে যে, একাজ শুধু হিন্দুর, আর কাহারও নয়।

[বর্তমান হিন্দু-মুসলমান সমস্যা — ১৯শে আশ্বিন, ১৩৩৩ — শরৎ রচনাবলী — ৩য় খণ্ড, শরৎ সমিতি — পৃঃ-৪৭৩]

বিপ্লবী যোগী দার্শনিক শ্রীঅরবিন্দ আরও বহু পূর্বে এই সত্য উপলব্ধি ক'রে "ধর্ম" পত্রিকার ২য় সংখ্যায়, ১৪ই ভাদ্র, ১৩১৬ বঙ্গাব্দে লিখেছিলেন—

"আমরা কখনো মুসলমান ভ্রাতৃগণের তোষামোদ করি নাই, করিবও না। সরল মনে একপ্রাণ হইয়া তাহাদিগকে জাতিগঠন কার্যে ব্রতী হইতে আহ্বান করিয়াছি। সেই আহ্বান শ্রবণ করিয়া নিজের হিত ও কর্তব্য নির্ধারণ করা তাঁহাদের বুদ্ধি, ভাগ্য ও সাধুতার উপর নির্ভর করে। আমরা বিরোধ সৃষ্টি করিতে যাইব না ও বিপক্ষের বিরোধ সৃষ্টির সাহায্যও করিব না'। (শ্রীঅরবিন্দ)

বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী, যোগী, মনীষী, মর্ত্যধামে দিব্য জীবন প্রতিষ্ঠার উদ্‌গাতা ঋষি শ্রীঅরবিন্দ, বোমার মামলায় আলিপুর কারাগারে অবরুদ্ধ হবার পর বাসুদেব দর্শনান্তে মুক্তি লাভ ক'রে সর্বপ্রথম জনগণকে তাঁর উপলব্ধ সত্যকে পরিবেশন করেন তাঁর ঐতিহাসিক উত্তরপাড়া ভাষণে। তার নিষ্কর্ষ হ'চ্ছে — শুধু ভারতের জন্য নয়, বিশ্বের জন্যেই হিন্দু তথা সনাতন ধর্মের প্রয়োজন। হিন্দু ধর্মই ভারতের জাতীয়তা। কারণ, হিন্দুই একমাত্র অসাম্প্রদায়িক চেতনার বাণীবহ—

'....... I realised what the Hindu religion meant. Other religions are preponderatingly religions of faith and profession, but the Sanatan Dharma is life itself : it is a thing that has not so much to be believed as lived. This is the Dharma that for the salvation of humanity was cherished in the seclusion of this peninsula from of old, ... It is for the Dharma and by the Dharma that India exists...... That which we call the Hindu religion is really the eternal religion, because it is the Universal religion which embraces all others....... I say that it is the Sanatan Dharma which for us is nationalism. This Hindu nation was born with the Sanatan Dharma, with it it moves and with it grows........ The Sanatan Dharma, that is nationalism.

This is the message that I have to speak to you."

(Sri Aurobindo — Uttarpara Speach P — 5, 14)

হিন্দু মনে করে সমগ্র দেশই মহাশক্তি, মহামাতৃকা। তাই 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রের সৃষ্টি ও ভারতের সশস্ত্র ও নিরস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামে তার অপরিসীম অবদান ঐতিহাসিক সত্য। কিন্তু মুসলমান দেশকে 'মা' ব'লে গ্রহণ এবং বন্দনায় ধর্মীয় কারণে রাজী নন। ফলে অতীতে 'বন্দে মাতরম্' সংগীতের অঙ্গচ্ছেদ ক'রে জাতীয় সংগীত রূপে তাকে মুসলমানের কাছে গ্রাহ্য করাতে হয়। স্বাধীনোত্তর ভারতে পশ্চিমবঙ্গে 'বন্দে মাতরম্' সংগীতের শতবার্ষিকী উৎসব পালনে আপত্তি জানান আবার রাজনৈতিক তত্ত্বে ধর্মে অবিশ্বাসী কম্যুনিষ্ট মুসলমান সদস্যবৃন্দ ধর্মের রক্ষার দাবীতেই। ফলে, প্রগতিশীল হিন্দু নেতৃবৃন্দ তা মেনে নেন এবং সরকারী ভাবে ঐ উৎসব প্রত্যাহার করেন। ভারতের মুসলমানগণ দেশকে 'মা' ব'লে ডাকতে রাজী নন্ এবং তা প্রায় সকল দলের হিন্দু রাজনীতিকদের দ্বারা অনুমোদিতও হয়। কিন্তু আর একটি তথ্য আমাদের জানা প্রয়োজন। *সোভিয়েত রাশিয়া ও সমাজতান্ত্রিক চীনে* বহুসংখ্যক মুসলমান বাস করেন। সোভিয়েতের সংবিধানে দেশকে 'মাতা' রূপে বন্দনা এবং গ্রহণ স্পষ্ট নির্দেশ। তা না করলে হ'বে দেশের জনগণের বিরুদ্ধে গুরুতর অপরাধ—

'Defence of the Socialist 'Motherland' is the sacred duty of every citizen of the U.S.S.R. Betrayal of the 'Motherland' is the parent crimes against the people.'

(Art. 62 of the 1977 Constitution of the U.S.S.R)

সমাজতান্ত্রিক চীনের সংবিধানের সুনির্দিষ্ট নির্দেশ —

'It is the sacred duty of every citizen to defend the 'Motherland' and resist aggression.' (Art 55 of the 1982 Constitution of Chinese Republic)

চীন এবং রাশিয়ার মুসলমানগণ দেশকে 'মাতা' ব'লে স্বীকারে বাধ্য। না ক'রলে সরকারের দ্বারা দেশদ্রোহী রূপে শাস্তির যোগ্য। আর, ভারতে, বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গে কিছু সংখ্যালঘু মুসলমানের দেশকে 'মা' ব'লে ডাকার বিরুদ্ধতা তথা দেশদ্রোহিতা অসাম্প্রদায়িক (?) হিন্দু নেতৃবৃন্দের দ্বারা অঙ্গীকৃত এবং অভিনন্দিত। ফলে ঐ শতবার্ষিকী উৎসব সরকার কর্তৃক প্রত্যাহৃত। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সংবিধান বিশেষজ্ঞ, ভারতের আইনের জাতীয় অধ্যাপক পদ্মভূষণ ডঃ দুর্গাদাস বসুর এই বিষয়ে আলোচনা —

'What is not anti-Islamic in Russia and China, cannot be anti-Islamic in West Bengal' (Introduction to the Const. of India 11th Ed. P—389)

এমনকি বিধান সভার সহ-সভাপতি ক্ষমতাসীন ফ্রন্টের বিশিষ্ট মুসলমান নেতা প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন —

'We are Muslims first and Indians afterwards.... Muslim culture is the main stream in India and others must join (Truth P.—569, 11. 1. 1980)

আর একটি বাস্তব সত্য হ'চ্ছে যে অখণ্ড ভারতে এবং খণ্ডিত ভারতেও মুসলমান-অধ্যুষিত অঞ্চলেই হয় সাম্প্রদায়িক অশান্তি। অপর ধর্মাবলম্বীর অনুষ্ঠান এবং শোভাযাত্রা আক্রমণ, প্রকাশ্যে গোহত্যা এবং নির্লজ্জ নারীহরণ পরিলক্ষিত হয়। প্রাক্ স্বাধীন যুগে এবং স্বাধীনতার পরে পূর্ববঙ্গে শুক্রবারে মধ্যাহ্ন প্রার্থনার পরই দলবদ্ধভাবে হিন্দুর উপর আক্রমণ পরিচালিত হ'ত। প্রশাসন তখন নিষ্ক্রিয়, ধৃতরাষ্ট্র। খণ্ডিত ভারতেও মধ্যে মধ্যে তারই পুনরাবৃত্তি ঘটে। সদ্য দিল্লীর দাঙ্গার পূর্বে জামা মসজিদের উপাসনার পর প্রখর দিবালোকে ৬০ হাজার মুসলমান পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলিতে সংঘবদ্ধ আক্রমণে জনজীবন বিপর্যস্ত ক'রে তুলেন। সকল সংবাদপত্রেই এই সংবাদ পরিবেশিত হয়। সংখ্যালঘুর ধর্মস্থান হ'তে সংখ্যাগুরুর উপর সশস্ত্র আক্রমণের অস্বাভাবিক ঘটনা ভারত ব্যতীত আর কোথাও দেখা যায় না।

পক্ষান্তরে হিন্দুর উপাসনান্তে মন্দির হ'তে কোথাও সংখ্যালঘুর উপর আক্রমণ, সংখ্যালঘুর নারীকে হরণ এবং মসজিদ কলুষীকরণ দেখা যায় না। হিন্দু মন্দিরের সামনে দিয়ে মুসলমানের ঈদের শোভাযাত্রায় হিন্দু কখনো আপত্তি করে না। কিন্তু মসজিদের সামনে দিয়ে রাজনৈতিক বা অন্যবিধ উচ্চ স্লোগান সহ শোভাযাত্রায় বাধা না থাকলেও হিন্দুর ধর্মীয় শোভাযাত্রাতেই কেবল প্রবল আপত্তি। ফলে সৃষ্ট হয় নানা অশান্তি। মাইক ব্যবহারে সর্বত্রই সরকারী অনুমোদন আইনের বিধান। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সকল মসজিদেই সরকারের অনুমতির জন্য কোনো আবেদন না ক'রেই মাইকে দৈনিক পাঁচবার আজান দেওয়া হয়। সরকার কোথাও আইনের প্রয়োগ ক'রতে গেছেন ব'লে শোনা যায় নি।

সংখ্যাগুরুর বিশ্বাসে আঘাত ক'রে প্রকাশ্যে গোহত্যা এবং গোমাংস কেনা-বেচায় সংখ্যালঘু মুসলমানকে কোনো রাজনৈতিক দল ও সরকার বাধা দেয়নি। কিন্তু, সংখ্যালঘুর বিশ্বাসকে আঘাত করার জন্য হিন্দু কোথাও শূকরের মাংসের প্রদর্শন করে না। প্রগতিশীল পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতার মর্মকেন্দ্র

রেড়রোডে প্রকাশ্য সার্বজনীন রাস্তায় গাড়ী ঘোড়া বন্ধ ক'রে সংখ্যালঘু মুসলমানের সমবেত নমাজ প্রতি বর্ষেই অনুষ্ঠিত হয়। কোনো হিন্দু তার জন্য আপত্তি করে না। কিন্তু ঐ স্থানের নিকটেই মনুমেন্টের পদতলে যানবাহন বন্ধ না ক'রেও সংখ্যাগুরু হিন্দুর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বিজয়াসম্মেলন, শ্রীচৈতন্য-জয়ন্তীর অনুমতি সরকার হ'তে মেলে না। মুসলমান সংখ্যাগুরু ব'লে এই ভারতেই কাশ্মীরের বিশেষ ব্যবস্থা রক্ষণে প্রায় সকল রাজনৈতিক দল কটিবদ্ধ। কিন্তু হিন্দু সংখ্যাবহুল অঞ্চলের জন্য কোন বিশেষ ব্যবস্থা অচিন্তনীয়। আফগানিস্থানের ইসলামীসত্তা রক্ষার জন্য বেলগ্রেডে সম্প্রতি জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনে সকল রাষ্ট্র একমত হ'য়ে প্রস্তাব নিল। কিন্তু অধিকাংশ হিন্দুর বাসভূমি ভারতের হিন্দু সত্তা রক্ষার কথা বললে সবাই একসঙ্গে শিবানাদ ক'রে ওঠে।

আবার ভারতেরই খৃষ্টান জনবহুল অঞ্চল নাগাল্যাণ্ড, মিজোরাম, মেঘালয় প্রভৃতি রাজ্যে প্রকাশ্যে বিদ্যালয়ে, পার্কে, সরস্বতী পূজা, দুর্গাপূজা কালীপূজা সরকারী আদেশে নিষিদ্ধ। কিন্তু হিন্দুপ্রধান অঞ্চলে বড়দিন প্রভৃতি খৃষ্টীয় উৎসব নিষিদ্ধ নয়।

সেবার আড়ালে ধর্মান্তরীকরণের মাধ্যমে দেশদ্রোহিতার প্রসারণে বৈদেশিক অর্থে মিশনারীদের অপপ্রয়াস আশ্চর্য সহিষ্ণুতার সঙ্গে সরকার, রাজনৈতিক দল এবং আত্মসুখনিমগ্ন জনগণের বৃহদাংশের দ্বারা সুগৃহীত এবং ঔদার্য্যের নামে বন্দিত ও নন্দিত। খণ্ডিত ভারতের খ্রীষ্টান এবং মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতেই বিচ্ছিন্নতার সর্পিল সঞ্চরণ পরিলক্ষিত হয়। উত্তর পূর্বভারতে ত্রিপুরা, নাগাল্যাণ্ড প্রভৃতিতে প্রায় প্রতিটি গীর্জা অস্ত্রাগার এবং ধর্মান্তরিত ভারতসন্তানেরা বিদ্রোহীতে রূপান্তরিত। ধর্মে অবিশ্বাসী, বৈদেশিক বিপ্লবাদর্শে অনুপ্রাণিত কোনো এক রাজনৈতিক দলের উগ্র এবং হিংস্র আন্দোলন আর এক অশনিসংকেত। ভারত খণ্ডনের দাবীদার মুসলীম লীগের এবং বৈদেশিক মিশনারীদের অর্থে ও প্ররোচনায় পৃথক রাজ্য ও রাষ্ট্র গঠনে তথা পুনরায় দেশমাতৃকার খণ্ডীকরণে ভারতবাসিঘাতী সশস্ত্র সংগ্রামে কটিবদ্ধ গোর্খাল্যাণ্ড, ঝাড়খণ্ড, উত্তরাখণ্ড প্রভৃতি আন্দোলনকারীদের কখনো নির্বাচনে, কখনো বা রাজনৈতিক আন্দোলনে তাঁদের সংঘবদ্ধ হবার প্রয়াস জাতীয় জীবনের আর একটি দুর্ভাগ্য।

আবার পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত অঞ্চলগুলি ও উত্তরপ্রদেশ, বিহার, কেরালা, কাশ্মীর ও হায়দ্রাবাদের বহু স্থানে মসজিদ হ'তে প্রায়ই বহুবিধ অস্ত্র আবিষ্কৃত হয়। সীমান্ত অঞ্চলগুলি অনুপ্রবেশকারীদের অবাধ বিচরণ ক্ষেত্র এবং বহু মুসলমানের গৃহ তাদের নিশ্চিন্ত আবাস-গৃহ। সম্প্রতি সরকারী পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে বহু লক্ষ মুসলমান অনুপ্রবেশকারী সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে এবং কলকাতায় রাজাবাজার,

খিদিরপুর প্রভৃতি স্থানে জন-বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। ভোটের লোভে রাজনৈতিক নেতাদের দ্বারা বহিরাগতদের আপ্যায়ন এবং পৃষ্ঠপোষণ পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির দুর্লক্ষণ। দেশদ্রোহী অনুপ্রবেশকারীদের সংবাদ দিয়ে দেশকে যাঁরা নিরাপত্তার জন্য সচেতন করেন, তাঁদের প্রতি সাম্প্রদায়িকতার দোষারোপ রাজনৈতিক দলগুলির এবং প্রশাসনের একাংশের লক্ষণীয় প্রবণতা।

হিন্দু দেশকে মা ব'লে জানে। তাই, দেশবাসী হিন্দু-মুসলমান-খ্রীষ্টান সকলকেই ভাই ব'লে মনে করে। বিবেকানন্দের বীরবাণীতে তারা উদ্বুদ্ধ। ভারতকে যারা মা ব'লে জানে না, মানে না, ভারতবাসীমাত্রকেই ভাই ব'লে মনে করে না, তাদের তোষণ এবং পোষণ তো পরিণামে দেশদ্রোহিতা, তা অসাম্প্রদায়িকতা বা ঔদার্য কখনো নয়।

রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, তিলক, অরবিন্দ, গান্ধিজী, চিত্তরঞ্জন, সুভাষচন্দ্র প্রমুখ নেতৃবৃন্দ নিজেদের কখনো অ-হিন্দু ব'লে কৃত্রিম মৈত্রীস্থাপনের অপপ্রয়াস করেন নি। আদর্শে এবং আচরণে হিন্দুত্বকেই তাঁরা সগর্বে গ্রহণ করেছিলেন।

ভারতের শাশ্বত সংস্কৃতি ও ধর্ম হিন্দুত্বকে না জেনে যাঁরা ঔদার্যের নামে আত্মবিস্মৃতিকেই বরণ ক'রে নিতে চাইছেন, তাঁদের স্মরণ করানো যেতে পারে ভারতে প্রগতির পুরোনায়ক রাজা রামমোহন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ১৩১৫ সালে লিখিত 'পূর্ব ও পশ্চিম' প্রবন্ধের অংশবিশেষ — 'রামমোহন যে পশ্চিমের ভাবকে আত্মসাৎ করিতে পারিয়াছিলেন তাহার প্রধান কারণ পশ্চিম তাঁহাকে অভিভূত করে নাই, তাঁহার নিজের দিকে দুর্বলতা ছিল না। তিনি নিজের প্রতিষ্ঠাভূমির উপর দাঁড়াইয়া বাহিরের সামগ্রী আহরণ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ঐশ্বর্য কোথায়, তাহা তাঁহার অগোচর ছিল না। এবং তাহাকে তিনি নিজস্ব করিয়াছিলেন। এই জন্যই যেখানে যাহা পাইয়াছেন তাহা বিচার করিবার নিক্তি ও মানদণ্ড তাঁহার হাতে ছিল। কোনো মূল্য না বুঝিয়া তিনি মুক্তের মতো আপনাকে বিলাইয়া দিয়া অঞ্জলি পূরণ করেন নাই।'

কালের গতিতে হিন্দুর মধ্যে যে আবর্জনা এসেছিল, তাকেই ত্যাগ ক'রতে বলেছিলেন, হিন্দুত্বকে নয়। কারণ, বিদেশাগত মনস্বিনী, ভারতের রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের অন্যতম নেত্রী এ্যানি ব্যাসান্টের মতো তাঁরাও বিশ্বাস করতেন—

'ভারতবর্ষের মূল হিন্দুত্বরূপী মৃত্তিকাতে প্রোথিত। যদি এই মৃত্তিকা অপসারিত করা হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষরূপী বৃক্ষ শুষ্ক হইয়া যাইবে — যদি হিন্দুত্ব বিলীন হইয়া যায় তাহা হইলে অবশিষ্ট কি রহিল ? তখন সম্ভবতঃ এইটুকু স্মরণে থাকিবে যে, ভারত নামক একটি ভৌগোলিক দেশ ছিল।'

পরিশেষে, কোন সাধু সন্ন্যাসী ধর্মনেতার নয়, বঙ্গভারতের সাংস্কৃতিক প্রাণপুরুষ, ক্রান্তদর্শী, মানবপ্রেমের অবিসংবাদী ঋষি, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের বাণীতেই আমাদের চিত্তকে সঞ্জীবিত করি।'

"আমরা যে ধর্মকে গ্রহণ করিয়াছি তাহা বিশ্বজনীন, তথাপি তাহা হিন্দুর ধর্ম। এই বিশ্বধর্মকে আমরা হিন্দুরই চিত্ত দিয়া চিন্তা করিয়াছি, হিন্দুর চিত্ত দিয়াই গ্রহণ করিয়াছি! শুধু ব্রহ্মের উপাসনার মধ্যেও একটি গভীর বিশেষত্ব আছেই। এই বিশেষত্বের মধ্যে বহু শত বৎসরের হিন্দুর অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান, হিন্দুর ধ্যান-দৃষ্টির বিশেষত্ব ওতঃপ্রোতভাবে মিলিত হইয়া আছে।'

(রবীন্দ্র রচনাবলী — ত্রয়োদশ খণ্ড — পৃঃ - ১৭৮)

'যে আপনাকে পর করে সে পরকে আপন করে না। যে আপন ঘরকে অস্বীকার করে, কখনোই বিশ্ব তাহার ঘরে আতিথ্য করিতে আসে না। নিজের পদরক্ষার স্থানটুকুকে পরিত্যাগ করার দ্বারাই যে চরাচরের বিরাট ক্ষেত্রকে অধিকার করা যায় একথা কখনোই শ্রদ্ধেয় হইতে পারে না।' (ঐ-পৃঃ - ১৭৯)

'হিন্দুত্বের ধারণাকে তো আমরা নষ্ট করিতে চাই না, হিন্দুত্বের ধারণাকে আমরা বড়ো করিয়া তুলিতে চাই।' (ঐ-পৃঃ - ১৮৭)

অ-সাম্প্রদায়িকতার নামে আত্মবিস্মৃতির দুর্বুদ্ধি হ'তে মঙ্গলের অধিদেবতা আমাদের চেতনাকে জাগ্রত করুন —

"স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু"।

শ্রীঃ

সমর্পণ-পত্রম্

সনাতন হিন্দু ধর্ম সংরক্ষণে ধৃতব্রত,
কর্মযোগী ভক্তিমূর্তি

হিন্দুজনতা-জনার্দনের
কল্যাণকরকমলে নিবেদিত

জনানাং হিন্দুসংঘানাং
জনার্দন-স্বরূপিণে।
হিন্দূনাং বোধনে নিত্যং
গ্রন্থোঽয়ং বিনিবেদ্যতে ॥

ইতি
অনন্তশ্রীমৎসীতারামদাসওঁঙ্কারনাথকিঙ্করেণ
শ্রীধ্যানেশ নারায়ণ দেবশর্মণা